শির্ক কী ও কেন?

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. মুহাম্মদ মুয্‌যাম্মিল আলী

শির্কের প্রকারভেদ

শর‘য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে শির্ককারীর পরিণতি বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, শির্ক মূলত তিন প্রকার :

প্রথম প্রকার : শির্কে আকবার বা বড় শির্ক

শির্কে আকবার এর সংজ্ঞা :

বিশ্বাস জাতীয় বিষয়াদি ও উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলার সাথে কাউকে শরীক বা সমান করাই মূলত শির্কে আকবার। কুরআনুল কারীমে উপাসনা কেন্দ্রিক শির্ক সম্পর্কে অধিক আলোচনা হওয়ার কারণে অনেকে শির্কে আকবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এটাকে শুধু উপাসনার সাথেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যেমন-

কেউ এর সংজ্ঞা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন : “শির্কে আকবার হচ্ছে : আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যেমন- অন্যকে আহ্বান করা, অন্যের নিকট কিছু কামনা করা, অন্যকে ভয় করা, অন্যকে আল্লাহর ন্যায় ভালোবাসা, অন্যের জন্য পশু উৎসর্গ বা মানত করা।”

কেউ আরো সংক্ষেপ করে বলেছেন : “আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে আহ্বান করাই হচ্ছে শির্কে আকবার।”

কেউ বলেন : “আল্লাহর উপাসনাসমূহের কোনো উপাসনা গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে করাকে শির্কে আকবার বলা হয়।”[1] তবে যেহেতু শির্কে আকবার কেবলমাত্র উপাসনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে তা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের মধ্যেও হয়ে থাকে, সে জন্য আমার মতে এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ হওয়া উচিত :

“আল্লাহ তা‘আলার নামাবলী ও গুণাবলীর যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যে বৈশিষ্ট্যগুণে তিনি আমাদের একক রব ও উপাস্য, আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা কোনো অলি দরবেশ, জিন-পরী বা গ্রহ ও তারকা, গাছ-পালা ও পাথর ইত্যাদিকে সে সব বৈশিষ্ট্যের কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্যের সমান বা আংশিক অধিকারী বলে মনে করা এবং নবী, অলী, গাছ-পালা ও পাথর ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে মুখ, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অন্তর দ্বারা উপাসনামূলক কোনো কর্ম করাকে শির্কে আকবার বলা হয়।”

শির্কে আকবারকারীর পরিণতি :

পরিণতির দিক বিবেচনা করে এ শির্ককে বড় শির্ক বলা হয়। কেননা, তা শির্ককারীকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণভাবে বের করে দেয়। কারণ; তা একটা প্রকাশ্য কুফরী কাজ। যেমন- কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡ﴾ [البقرة: ١٠٢]

“তাঁরা (হারূত ও মারূত) কাউকে এ কথা বলেই জাদু শিক্ষা দিতেন যে, আমরা তোমাদের জন্য ফেতনা বিশেষ, সুতরাং তোমরা তা শিক্ষা করে কুফরী করো না।”[2]

আমরা বাহ্যত দেখতে পাচ্ছি যে, এ আয়াতে জাদু শিক্ষা করাকে কুফরী কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে; এটা এ

জন্যে যে, তা নিজ থেকে মানুষের অকল্যাণ করতে পারে এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষা করা শির্কের অন্তর্গত কাজ। অনুরূপভাবে হাদীসে কুদসীতে দেখতে পাওয়া যায় যে, তারকার প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় বলে বিশ্বাস করা শির্কী বিশ্বাস হওয়া সত্ত্বেও এটিকে কুফরী বলে গণ্য করা হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

" أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ "

"আমার বান্দাদের মধ্যে কতিপয় বান্দা আমার উপর বিশ্বাসী আর কতিপয় অবিশ্বাসী হয়েছে, যারা এ কথা বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলার করুণায় আমাদেরকে বৃষ্টি দান করা হয়েছে, তারা আমার উপর ঈমান এনেছে। আর যারা বললো : অমুক অমুক তারকার প্রভাবের ফলে আমাদেরকে বৃষ্টি দান করা হয়েছে, তারা আমাকে অস্বীকার করেছে এবং তারকার প্রভাবের প্রতি বিশ্বাসী হয়েছে।"[3]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে জাদু শিক্ষা করা আর কোনো তারকার প্রভাবে বৃষ্টি হয় বলে বিশ্বাস করা যদি কুফরী কর্ম বলে স্বীকৃত হয়, তা হলে জ্ঞানগত, উপাসনাগত, পরিচালনাগত ও অভ্যাসগত অন্যান্য যত সব শির্ক রয়েছে, নিঃসন্দেহে তাও কুফরী কর্ম বলে গণ্য হবে। কেউ যদি এ সব বিষয়ে সতর্ক না হয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করা ছাড়াই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তবে তার সমগ্র জীবনের যাবতীয় সৎকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেয়ে জান্নাত তার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে এবং জাহান্নামই তার চিরস্থায়ী আবাস স্থলে পরিণত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُ﴾ [المائدة: ٧٢]

"যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম।"[4]

মানুষেরা যাতে এ ধরনের শির্ক করা থেকে সতর্ক হয়, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর প্রতি এই বলে সতর্কবাণী দিয়েছেন :

﴿لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥﴾ [الزمر: ٦٥]

"তুমি যদি শির্ক কর, তবে তোমার যাবতীয় 'আমল ভস্ম করে দেয়া হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হয়ে যাবে।"[5]

শির্কের পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ ভাবে সতর্ক করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর উম্মতকে এ সম্পর্কে সতর্ক করা। তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, তারা যদি বুঝে বা না বুঝে কোনো শির্কী বিশ্বাস পোষণ করে বা কোন শির্কী কর্ম করে, তা হলে তাদের সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাতসহ জীবনের অন্যান্য যাবতীয় সৎকর্ম আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে যাবে।

শির্ক করার ফলে যার অবস্থা এই হয়ে দাঁড়ায়, সে ব্যক্তি যদি স্বীয় শির্ক থেকে স্বেচ্ছায় পরিপূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে ইসলামে নতুন করে প্রবেশ না করে, তা হলে আখেরাতে সে জাহান্নামী হবে। আল্লাহ তা'আলা করুণার সাগর হয়ে থাকলেও কাফির-মুশরিকদের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর। তাই তিনি তাদের সৎকর্মের বিষয়টি কোনো বিবেচনায় এনে তাদের প্রতি কোনো করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন না। যারা স্বেচ্ছায় তা পরিত্যাগ না করে তিনি তাদেরকে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করার জন্যে তাদের অপকর্ম আরো চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেন।

যেমনটি সুযোগ করে দিয়ে পাকড়াও করেছিলেন আরবের কুরাইশ বংশের কাফির ও মুশরিকদের। কুরআনুল কারীমের বর্ণনানুযায়ী যদিও তারা আল্লাহ তা'আলাকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীসহ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা এবং যাবতীয় বিষয়াদির পরিচালনাকারী বলে অকপটে স্বীকার করতো। যেমন- এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

﴿ وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ﴾ [الزمر: ٣٨]

"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেসা করো যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, তখন তারা বলবে আল্লাহই তা সৃষ্টি করেছেন।"[6] অপর স্থানে বলেছেন:

﴿قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ﴾ [يونس: ٣١]

"তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর, কে তোমাদেরকে জীবিকা দান করে আকাশ ও জমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা করেন? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ।"[7]

আল্লাহ তা'আলাকে সবকিছুর স্রষ্টা, জীবন ও জীবিকা দানকারী ও পরিচালনাকারী বিশ্বাস করার পাশাপাশি তারা নিজেদেরকে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর দ্বীনের যথার্থ অনুসারী বলেও দাবী করতো। সে দ্বীনের উপাসনাদির মধ্যকার কিছু উপাসনা যেমন- কা'বা গৃহের হজ্জ করা, সাফা ও মারওয়াঃ পর্বতদ্বয়ের মাঝে সা'য়ী করা, কুরবানী করা, মিনায় অবস্থান গ্রহণ করা ইত্যাদি উপাসনাও তারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করতো। কিন্তু, তারা শির্ক করতো বলে তাদের এ সব সৎকর্ম তাদের কোন উপকারে আসে নি। বরং তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার এ-হুকুম জারী হয়েছিল যে, তারা কাফির ও মুশরিক, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, যেখানে তারা সবাই প্রবেশ করবে অত্যন্ত নিগৃহীত হয়ে।

দ্বিতীয় প্রকার : শির্কে আসগার বা ছোট শির্ক

শির্কে আসগার এর সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে কোনো কোনো মনীষী বলেছেন : "শির্কে আকবার নয় এমন যে-সব কর্মকে শরী'আতের 'নস' অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা শির্ক বলে নামকরণ করা হয়েছে, সেগুলোই হচ্ছে শির্কে আসগার। যেমন- কেউ যদি বলে : (ماشاء الله و شئت)'আল্লাহ আর আপনি যা চান', (و لو الله و أنت) আল্লাহ আর আপনি যদি উপস্থিত না থাকতেন তা হলে আমার মহা বিপদ হয়ে যেতো'। অনুরূপভাবে আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে শপথ করা ইত্যাদি।"[8]

ড. ইব্রাহীম বুরাইকান এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন : "আমলের ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলার সমান করে নেয়াকে শির্কে আসগর বলা হয়, যেমন- কোন কাজে বা কথায় লোক দেখানোর ভাব করা।"[9]

ইমাম ইবন কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাঃ (৬৯১-৭৫১হিঃ) শির্কে আসগার এর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেনঃ "উপাসনায় লোক দেখানো ভাব করা, মানুষের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা, আমি আল্লাহ ও আপনার উপর ভরসা করেছি এমনটি বলা, আল্লাহ ও আপনি না হলে এমনটি হতো। এ সব উদাহরণ প্রদানের পর তিনি বলেনঃ শির্কে আসগার কখনও কর্তা ব্যক্তির মানসিক অবস্থা ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শির্কে আকবারেও রূপান্তরিত হতে পারে।"[10]

আমার মতে ‘শির্কে আসগার’এর সংজ্ঞা হলো : ‘‘এমন সব কথা বা কাজ বাহ্যিকভাবে গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তা‘আলার সাথে সমান করে নেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও এই সমান করাটি প্রকৃতপক্ষে কর্তাব্যক্তির উদ্দেশ্য নয়।’’ ‘শির্কে আসগার’ এর কতিপয় উদাহরণ উপরে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নের উদাহরণগুলোও তা পরিচয়ের জন্য লক্ষ্যণীয় : যেমন- কোনো ব্যক্তির কথা : ‘আল্লাহ আর এই পোষা কুকুরটি না হলে আজ রাতে আমার বাড়ীতে চুরি হয়ে যেতো।’ ‘আল্লাহ এবং আপনি না হলে আজকে মহা অঘটন ঘটে যেতো।’ ‘আমি মাটি হাতে নিয়ে বা মায়ের নাম নিয়ে বা সন্তানের মাথায় হাত রেখে শপথ করে বলছি।’ ‘আমি আল্লাহর অনুগ্রহে এবং আপনাদের দু‘আয় ভাল আছি’ ইত্যাদি ধরনের কথা।

শর‘য়ী দৃষ্টিতে শির্কে আসগারকারীর পরিণতি :

এ শির্কটি পূর্বে বর্ণিত ‘শির্কে আকবার’ এর চেয়ে কম বিপজ্জনক। কেননা, এটি কর্তাব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে না বা এতে যে শির্কে আকবার হয়ে থাকে, তাও বলা যায় না। এর প্রমাণ হলো- হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ‘‘একজন মুসলিম ব্যক্তি স্বপ্নে এক ইয়াহূদী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করলে ইয়াহূদী লোকটি তাঁকে বললো : ‘তোমরা অত্যন্ত ভাল জাতি যদি না তোমরা শির্ক করতে। তোমরা বলে থাকো- আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান’। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ স্বপ্নের কথা বলা হলে তিনি বলেন : ‘‘আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের এ বিষয় সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত আছি, তোমরা সে ভাবে কথা না বলে এ ভাবে বলো :

«مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ»

‘‘আল্লাহ তা‘আলা যা চান অতঃপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান’’।[11] এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, ইসলামের প্রারম্ভিক আমলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের মাঝে ‘আল্লাহ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান’, এ-জাতীয় কথা-বার্তা বলার প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে এমন কথা বলা থেকে বারণ করেন এবং এ ধরনের কথার বদলে নিম্নোক্ত কথা বলতে শিক্ষা দেন :

«ما شاء الله وحده»

‘‘আল্লাহ তা‘আলা এককভাবে যা চান’’।[12]

অনুরূপভাবে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীস দ্বারাও সাহাবীদের মাঝে এ জাতীয় কথা বলার প্রচলন থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন : ‘‘এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কোন বিষয়ে কথা বলা প্রসঙ্গে বললো :

«ما شاء الله وشئت»

‘আল্লাহ এবং আপনি যা চান’।

লোকটির এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

«أجعلتني والله عدلا بل ما شاء الله وحده»

‘‘তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নিলে? বরং একমাত্র আল্লাহ যা চেয়েছেন।’’[13]

এখন কথা হলো: এ জাতীয় কথা-বার্তা যদি তার কথককে ইসলাম থেকে বের করে দেয়ার মত অপরাধ হতো, তা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ থেকেই অন্যান্য শির্কী কর্মকাণ্ড নিষেধ করার সাথে সাথে এ ধরনের কথা বলাও নিষেধ করে দিতেন। কিন্তু তা বিলম্বে নিষেধ করাতে প্রমাণিত হয় যে, এ জাতীয় কথা অপরাধের দিক থেকে 'শির্কে আকবার' এর মত বড় অপরাধ নয়। তবে তা যে সাধারণ অপরাধের মত একটি অপরাধ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।[14] তবে এথেকে বিরত থাকলে এর দ্বারা যে আল্লাহর তাওহীদের হেফাযত ও সংরক্ষণ হয়, তা বলা-ই বাহুল্য।[15] এ অপরাধ থেকে তাওবা করা ছাড়া কেউ মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে নিজ থেকে তা মাফ করে দিতে পারেন। অথবা এমন অপরাধী ব্যক্তি শাফা'আতের সুবিধা পেয়ে হাশরের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফা'আত পেয়ে মুক্তি পেতে পারে। নতুবা অপরাধের মাত্রানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করে পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা অন্য কোনো মু'মিন ও ফেরেশতাদের শাফা'আত পেয়ে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে বেহেশতে প্রবেশের সুযোগ পাবে।

তৃতীয় প্রকার : শির্কে খফী বা গোপন শির্ক

গোপন শির্ক হচ্ছে সেই সব শির্ক, যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এবং সৃষ্টির মাঝে সমকক্ষতার গন্ধ পাওয়া যায়। তবে তা শির্কে আকবার না শির্কে আসগারের অন্তর্গত, তা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় না। এ জন্যে যে, ব্যক্তির মুখের কথা ও তার অন্তরে কী ইচ্ছা রয়েছে তা জানার কোনো উপায় নেই।[16] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের শির্কের প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেছেন :

«إِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ»

"এটা পিপীলিকার ধীর পদক্ষেপের চেয়েও গোপন।"[17]

কর্তাব্যক্তির মনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রকার শির্কের সাথে উপর্যুক্ত দু'টি শির্কের সম্পর্ক থাকার কারণে কোনো কোনো মনীষী এটাকে শির্কে আসগার এর মধ্যেই গণ্য করেছেন। এ চিন্তার আলোকেই শেখ 'আব্দুল 'আযীয আল-মুহাম্মদ আস-সালমান শির্ককে মোট তিন ভাগে বিভক্ত না করে দু'ভাগে বিভক্ত করে শির্কে খফীকে শির্কে আসগারের মধ্যেই গণ্য করেছেন।[18]আমার মতে শির্কের প্রকার বর্ণনা প্রসঙ্গে শেখ 'আব্দুল 'আযীয যে মত পোষণ করেছেন সেটাই সঠিক। কারণ, যারা শির্ককে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন তারা তৃতীয় প্রকার শির্ককে দ্বিতীয় প্রকার শির্ক থেকে ভিন্নভাবে পরিচয় করার জন্যে পৃথক কোনো উদাহরণ পেশ করেননি। তাদের আলোচনা পড়লে মনে হয় যেন শির্কে খফী অতি গোপন থাকার কারণে তারা দ্বিতীয় প্রকারের মধ্য থেকেই তৃতীয় প্রকার শির্কের জন্ম দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এ বিভক্তির মাঝে তেমন কোনো লাভ নেই কারণ; শর'য়ী হুকুমের দিক থেকে শির্কে আসগার ও শির্কে খফী যে একই পর্যায়ভুক্ত, এ বিষয়ে কারো দ্বি'মত নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এ দু'টি শির্ককে মূলত যে কোনো একটি নামে নামকরণ করাই যুক্তিযুক্ত ছিল। অথবা শির্কে আকবার নয় এমন যাবতীয় শির্ককে এ দু'টি নামে নামকরণ করা যেতো। শির্কে আসগার এ বিবেচনায় যে, তা শির্কে আকবর এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের, আর শির্কে খফী এ বিবেচনায় যে, এ শির্কটি বক্তার মনের গভীরে গোপন থাকায় তা শির্কে আকবার না আসগার এর অন্তর্গত- তা নিরূপণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার।

>

ফুটনোট

[1]. ‘আব্দুল ‘আযীয আল-মুহাম্মদ আস-সালমান, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৭০।

[2]. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাহ: ১০২।

[3]. বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল আযান, বাব নং ৭২, হাদীস নং ৮১০, ১/২৯০; মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল ঈমান, বাব নং৩২, ১/৮৩।

[4]. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদাহ : ৭২।

[5]. আল-কুরআন, সূরা যুমার : ৬৫।

[6]. আল-কুরআন, সূরা আয-যুমার : ৩৮।

[7]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : ৩২।

[8]. আস-শায়খ ‘আব্দুল আযীয আস-সালমান, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৭০।

[9]. ড. ইব্রাহীম আল-বুরাইকান, প্রাগুক্ত; পৃ.১২৬।

[10]. আশ-শায়খ সুলাইমান ইবন ‘আব্দিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদিল ওয়াহহাব, তাইসীরুল ‘আযীযিল হামীদ ফী শরহে কিতাবিত তাওহীদ; (বৈরুত : আল-মাকতবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪০২হি.), পৃ.৪৫; আস-শায়খ আব্দুল ‘আযীয আস-সালমান, প্রাগুক্ত; পৃ.১৭০-১৭১।

[11].ইবনে মাজাহ, সুনান; কিতাবুল : কাফফারাত, বাব নং ১৩; ১/ ৬৮৫। মাজমাউয যাওয়াইদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, বুখারীর শর্ত অনুযায়ী এ হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য।

[12]. তদেব।

[13]. ইবনে কাছীর, তাফছীরুল ক্বুর‘আনিল ‘আযীম; (বৈরুত : দ্বারুল মা‘রিফাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.), ১/৬০।

[14]. ড. ইব্রাহীম বুরাইকান, প্রাগুক্ত; পৃ.১২৮।

[15]. ইবনে কাছীর, প্রাগুক্ত; ১/৬০।

[16]. ড. ইব্রাহীম বুরাইকান, প্রাগুক্ত; পৃ.১২৭। সংক্ষিপ্ত আকারে।

[17]. আহমদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত; ৪/৪০৩।

[18]. আশ-শায়খ ‘আব্দুল ‘আযীয আস-সালমান, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৭০, ১৭১।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12507

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন